সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ

বাংলাদেশে পূর্ণবয়সীদের মধ্যে শতকরা ০.৬ ভাগের মধ্যে সিজোফ্রেনিয়া পাওয়া গেছে। কাজেই জনসংখ্যায় এর পরিমাণ একেবারে কম নয়। মুস্কিল হলো সিজোফ্রেনিয়া সনাক্ত করা। মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ বা সাইকিয়াট্রিষ্টেরা স্কিজোফ্রেনিয়া সনাক্ত করে থাকেন। দ্রুত সনাক্ত করে দ্রুত চিকিৎসা দিলে এই রোগের চিকিৎসায় ভাল ফল আশা করা যায়।

সিজোফ্রেনিয়া একধরণের গুরুতর মানসিক রোগ। এই রোগীদের বিষয়ে মানুষ জানে অনেক কম, কিন্তু প্রচন্ড কৌতুহল সবার মাঝে। অনেকে বড় মানসিক হাসপাতালে যেতে চায় মানসিক রোগী দেখতে কেমন, তারা করে কি এসব দেখতে। সবাই অনেক ভুল ধারণা পোষণ করে। বাস্তবে এই রোগীরা প্রচন্ড একা। মানুষ তাকে কাছে টানেনা, তাকে ভয় পায়। তাকে অধিকার বঞ্চিত করে। অনেক রোগীর রোগ নির্ণয় হতে বছরের পর বছর লেগে যায়। তাদের চিকিৎসা বিঘ্নিত হয়। অনেকেই শিকার হয় অপচিকিৎসার। কবিরাজ আর ঝাড়ফুঁকওয়ালার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়। অনেকে বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পায়।

সিজোফ্রেনিয়ার অনেক ধরণের লক্ষণ আছে। এগুলোকে সাধারণভাবে 'পজেটিভ' ও 'নেগেটিভ' লক্ষণ এভাবে ভাগ করা যায়। কতগুলো বৈশিষ্ট্য যা মানুষের মধ্যে থাকার কথা, কিন্তু নেই, তাকে সাধারণ ভাষায় সিজোফ্রেনিয়ার **নেগেটিভ সিম্পটম** বা লক্ষণ বলে। আর কতগুলো বৈশিষ্ট্য যা মানুষের মধ্যে থাকার কথা নয়, কিন্তু রুগীর মধ্যে আছে, তাকে আমরা সিজোফ্রেনিয়ার **পজিটিভ সিম্পটম** বা লক্ষণ বলতে পারি।

নিচে সিজোফ্রেনিয়ার কতগুলো সাধারণ লক্ষণের উপর আলোকপাত করা হলো। এর থেকে আমরা রোগটি নির্ণয় করতে না পারলেও আমাদের মনে কিছুটা ধারণা তৈরী হবে যার থেকে আমরা কোন মানুষের সিজোফ্রেনিয়া থাকতে পারে বলে মনে করলে তাকে মানসিক চিকিৎসার জন্য মানসিক হাসপাতালে নিয়ে আসতে পারবো। তবে মনে রাখতে হবে সব লক্ষণ সবার মধ্যে থাকেনা। কাজেই এর কতগুলো যদি যথেষ্ট সময় ধরে থাকে ও যদি অনেক তীব্র হয় তবে আমরা রোগীকে একজন মানসিক ডাক্তার দিয়ে দেখিয়ে নিতে পারি।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের মধ্যে অনেক পজিটিভ লক্ষণ থাকে। প্রত্যক্ষণের অস্বাভাবিকতাকে বলে **হেলুসিনেশন**। সনাক্ত করার মতো কোন বাহ্যিক উদ্দীপক (যেমন, বস্তু, গন্ধ, শব্দ ইত্যাদি) ছাড়াই ব্যক্তি কোন কিছু প্রত্যক্ষণ করে। কোন বাহ্যিক উদ্দীপক ছাড়াই ব্যক্তি কোন কিছু শুনে, কোন কিছু দেখে, কোন গন্ধ পায়, কোন স্পর্শ পায়

বা কোন স্বাদ পায়। তবে মনে রাখতে হবে কোন একটা উদ্দীপককে ভুল ব্যাখ্যা করে ভিন্ন কিছু প্রত্যক্ষণ করলে তাকে হেলুসিনেশন বলেনা। তখন এটিকে বলে ইলুশন। যেমন, রশিকে আধা অন্ধকারে সাপ হিসাবে আমরা দেখতে পারি। এটি ইলুশন। হেলুসিনেশনে কোন উদ্দীপক, যেমন, কোন প্রকৃত বস্তু, শব্দ বা গন্ধ ইত্যাদি থাকবেনা। হেলুসিনেশনের বাংলা অলীক প্রত্যক্ষণ। তবে সড়াসড়ি ইংরেজী শব্দটি ব্যবহার করাই ভাল। ঘুমের মুহুর্তে বা ঘুম থেকে উঠার মুহুর্তে অনেক সময় একধরণের অলীক প্রত্যক্ষণ হয়। একে কিন্তু হেলুসিনেশন বলা যাবেনা। কোন ঔষধ, নেশাদ্রব্য বা তীব্র শারীরিক অসুস্থতার কারণে হেলুসিনেশন হলে তাকেও যথার্থ হেলুসিনশন বলা যাবেন। সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের নানা ধরণের হেলুসিনেশন হয়।

রোগী কানে কথা শুনে। রোগী একাই এই কথাগুলো শুনতে পায়। আশে-পাশের কেউ এই শব্দগুলো শুনতে পায়না। বোঝানোর জন্য রোগী অনেক সময় এগুলোকে গায়েবী আওয়াজও বলে। আসলে কোন গায়েবী বিষয় এটি নয়। অসুস্থতার কারণে সে কানে এমন ধরণের অদ্ভূত কথা শুনতে পায়। একে বলে **অডিটরি হেলুসিনেশন**। কখনো কখনো রোগী শব্দ শুনে, বা অস্পষ্ট কথা শুনতে পায়। সবচেয়ে বেশী দেখা যায় যে, রোগীকে কেউ কিছু বলছে বা তার নাম ধরে ডাকছে বা তাকে খারাপ কথা বলছে (রোগী একাই কিন্তু এগুলো শুনতে পাচ্ছে। আর কেউ শুনছেনা।)। যারা কথা বলছে তারা পুরুষ বা মহিলা হতে পারে, পরিচিত বা অপরিচিত মানুষ হতে পারে। তারা ভাল কথাও বলতে পারে আবার সমালোচনামূলক বা অন্যান্য খারাপ কথাও বলতে পারে। সাধারণতঃ স্কিজোফ্রেনিনিয়ার রোগীরা খারাপ ও কষ্টদায়ক কথাই বেশী শুনে। কথা না শুনে যদি শব্দ শুনে বা বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনে তবে এই ধরণের হেলুসিনেশন তলনামূলকভাবে কম গুরুতর। রোগীরা অনেক সময় বলে যে, তারা দুই বা ততোধিক লোকের কথা শুনতে পায়। এই ধরণের হেলিউসিনেশন থাকলে রোগীর সিজোফ্রেনিয়া থাকার যথেষ্ঠ সম্ভাবনা থাকে। কখনো কখনো রোগী বলে যে কোন একজন মানুষ সে কি কি করছে তার একটি ধারাবিবরণ দিচ্ছে। রোগীরা অনেক সময় বলে যে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি আলোচনা করছে সে এমনটা শুনতে পাচ্ছে। সাধারণতঃ রোগীকে নিয়েই তারা আলাপ করে। এধরণের হেলিউসিনেশন থাকলে রোগীর সিজোফ্রেনিয়া থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

রোগীর শরীরে অদ্ভূত ধরণের শারীরিক অনুভূতি হয়। যেমন, শরীরে জ্বালাপোড়া হয়। এছাড়া শরীরে পিন ফোটার মতো অনুভূতি হতে পারে। শরীরের আকৃতি বা গঠন বদলে গেছে রোগী এমনটা প্রত্যক্ষণ করতে পারে। এধরণের হেলিউসিনেশনকে **'সোমাটিক'** অথবা **'ট্যাকটাইল'** হেলুসিনেশন বলে।

রোগী অস্বাভাবিক গন্ধ পায় যা সাধারণতঃ খুব খারাপ ধরণের হয়। অনেকসময় রোগী মনে করে যে তার শরীর থেকেই গন্ধ বের হচ্ছে। একে **অলফ্যাক্টরি হেলুসিনেশন** বলে।

অনেক সময় রোগী তার খাবারের মধ্যে কোন বিশেষ ধরণের স্বাদ পায়। সাধারণতঃ খারাপ স্বাদ পায়। অন্যরা একই খাবরে কিন্তু এমন স্বাদ পাচ্ছেনা। একে বলে 'গাস্টেটরি হ্যালুসিনেশন'।

রোগী এমন মানুষদের বা এমন বস্তু বা এমন অবয়ব দেখে যা আসলে নেই। একে বলে **ভিজ্যুয়াল হেলুসিনেশন**। অনেক সময় রোগী অবয়ব বা রঙ দেখে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ বা মানুষের মতো দেখতে কিছু একটা দেখে। ধর্মীয় কোন চরিত্রও রোগী দেখতে পারে। যেমন, যীশু খ্রীষ্ট, শয়তান বা জ্বীন বা ভূত দেখতে পারে। ধর্মীয় বিষয়ে হেলুসিনেশন হলে তবে রোগীর শিক্ষাগত অবস্থা, তার আর্থ-সামজিক প্রেক্ষাপট বিচার করতে হবে। যেমন, বাংলাদেশে কেউ যদি একটা ভূত দেখে তবে তা সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা যায়। একে হেলুসিনেশন বলা যাবেনা। কিন্ত যদি ভূতের ধারণা তেমন প্রচলিত নয় এমন সমাজে কেউ যদি ভূত দেখে তবে সেটিকে হেলুসিনেশন বলা যেতে পারে। ঘুমের সময় বা ঘুম থেকে জাগার মুহর্তে যে ভিজ্যুয়াল হেলুসিনেশন হয় তা সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ বলে বিবেচনা করা যাবেনা। নেশাগ্রহণের ফলে সৃষ্ট ভিজ্যুয়াল হেলুসিনেশনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

চিন্তার বিষয়বস্তুর মধ্যে যখন গুরুতর অস্বাভাবিকতা পাওয়া যায় তাকে বলে **ডেলুশন বা ভ্রান্তধারণা** । রোগীর আর্থ-সামাজিক পটভূমি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়না এমন ধরণের ভ্রান্ত ধারণাই হলো ডেলুশন। এই ধারণাগুলো অত্যন্ত দৃঢ় ধরণের হয়। যুক্তি দিয়ে এই ধারণাগুলো টলানো যায়না। অবশ্য অল্পতীব্রতায় থাকলে রোগী কয়েক মাস পরে এগুলো যে ভুল সে বিষয়ে কিছুটা বুঝতে শুরু করে। তার মধ্যে এই ধারণার সত্যতা নিয়ে দ্বিধা তৈরী হয়। রোগীর আচরণ তার ডেলুশন দিয়ে প্রভাবিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। রোগী কতটা তীব্র ভাবে তার ভ্রান্তধারণা গুলোকে বিশ্বাস করে, এগুলো কতটা জটিল ধরণের, রোগী এই ধারণা দ্বারা পরিচলিত হয়ে কিছু করে কিনা, সে এই ভ্রান্তধারণাগুলোকে নিয়ে কতটা সন্দেহে ভুগে, সাধারণ মানুষের বিশ্বাস থেকে তার এই ডেলুশন গুলো কতটা পৃথক সে বিষয়ক তার ধারণা কি ইত্যাদি বিবেচনা করে তার ডেলুশনের অবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগী বিশ্বাস করে যে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, বা কোন না কোন উপায়ে তার ক্ষতি করার, তার মানহানি ইত্যাদি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে **পারসিকিউটরি ডেলুশন** বলে। রোগী বলে যে তাকে কিছু লোক অনুসরণ করছে, কেউ তার ই-মেইল মোবাইলের টেক্সট্ মেসেজগুলো, বা ফেসবুকের উপর নিয়মিত নজরদারি করছে, তার অফিসে বা বাসায় ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি বসিয়ে, তার মোবাইলে স্পাইং করার জন্য কোন সফ্টওয়্যার বসিয়ে দেয়া হয়েছে, তার বাথরুমে মাইক্রো ক্যামেরা বসিয়ে তার অস্বস্তিকর ছবি তোলার চেষ্টা চলছে। তার খাবারে খারাপ কিছু মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে। এই খাবার খেলে সে মারা যাবে, পাগল হয়ে যাবে বা অসুস্থ হয়ে যাবে। তার ঘনিষ্ঠজনই তার শত্রু ও তারা এক ধরণের গোয়েন্দাগিরি করছে ও তার ক্ষতি

করার চেষ্টা করছে। তার প্রতিবেশীরা তার পিছে লেগেছে। সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা, বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা ইত্যাদি তার পিছে লেগে গেছে। তার মাথায় মাইক্রোচিপ বসিয়ে স্যাটেলাইটের সাহায্যে বা মোবাইল নেটওয়ার্কের সাহায্যে তার ক্ষতি করার চেষ্টা চলছে। কারো কারো মধ্যে এবিষয়ে জটিল ধরণের ধারণা পাওয়া যায়। কখনো কখনো পারসিকিউটরি ডেলিউশন এত জটিল হয় যে এটি রোগীর জীবনের প্রায় সব কিছুর একটি ব্যাখ্যা দিয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলে।

রোগী বিশ্বাস করে যে তার স্বামী বা স্ত্রী বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত। এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে **ডেলুশন অব জেলাসি** বলে। ছোট-খাট সম্পর্কহীন বিষয়কে এই ধরণের চরিত্রহীনতার নিশ্চিত প্রমাণ হিসাবে রোগী হাজির করে। রোগী সাধারণতঃ স্ত্রীর বা স্বামীর চরিত্রহীনতা প্রমাণের জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা করে। একজন রোগী সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অফিসে যাওয়া বন্ধ করলেন। তার শিক্ষিকা স্ত্রী কোন পুরুষ শিক্ষকের সাথে কথা বলে কিনা তা দেখার জন্য দিনের পর দিন পাশের নির্মিয়মান বিল্ডিং এ বসে স্ত্রীর স্কুলের উপর নজরদাড়ি করতে লাগলেন। আরেকজন বেসরকারী গোয়েন্দা ভাড়া করে স্ত্রীর পিছনে লাগালেন। আরেকজন স্ত্রী তার স্বামীর ফেসবুক হ্যাক করার জন্য প্রফেশনাল হ্যাকার ভাড়া করলেন। এছাড়া নিয়মিত মোবাইল চেক করা, ব্যাগ চেক করা, হঠাৎ বাসায় হাজির হওয়া, পনের মিনিট পর পর ফোন করাতো আছেই। এক রোগী স্ত্রীকে বাসায় তালা মেরে আটকে রেখে অফিসে যেতেন যাতে স্ত্রী বাড়িওয়ালার সাথে প্রেম করতে না পারে। স্ত্রীটি বাড়িওয়ালার দিকে তাকিয়ে সৌজন্যের খাতিরে একবার হেসেছিলেন বলে এত সাবধানতা! আরেকজন ক্রমাগত তার প্রেমিকাকে চাপ দিতে যাতে তিনি তার আগের প্রেমিকের সাথে যৌন সম্পর্ক থাকার বিষয়টি স্বীকার করেন। আদতে প্রেমিকাটির এমন কোন সম্পকর্ই ছিলনা।

কোন ন্যায্য কারণ ছাড়াই রোগী বিশ্বাস করে যে সে কোন সর্বনাশা অন্যায় করেছে, মাপের অযোগ্য পাপ করে ফেলেছে। এবিষয়ে রোগী সারাক্ষণ ভাবতেই থাকে ও অপরাধবোধে ভোগে। এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে **‘ডেলুশন অব গিল্ট’** অথবা **‘ডেলুশন অব সিন’** বলে। একজন রোগী অপরাধবোধে ভুগতো কারণ শৈশবে সে একজন মানুষের বাগান থেকে না বলে একটি গোলাপ ফুল নিয়েছিল। একজন কৈশোরে হস্তমৈথুন করেছিল বলে ভয়াবহ অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়েছিল। রোগী ভাবলো -‘হস্তমৈথুন সৃষ্টিকর্তার বিধানের পরিপন্থি। নিশ্চয়ই তিনি আমাকে মারাত্মক শাস্তি দিবেন। আমি যুগ যুগ ধরে বিধাতার কোপানলে পুড়বো।’ রোগী যাকেই পায় তার কাছেই তার এই পাপের বিবরণ দিতে শুরু করলো। অর্থাৎ রোগী তার অপরাধের মাত্রাকে অনেক বাড়িয়ে দেখছে। সম্পর্ক নেই এমন কোন দূর্ঘটনার জন্য রোগী নিজেকে দায়ী মনে করতে পারে। যেমন, একটি সাইক্লোনে বহু মানুষ হতাহত হবার পর রোগী ভাবলো যে যেহেতু সে ঐ জনপদের একজনের উপর বিরক্ত ছিল তাই এই দূর্ঘটনা হয়েছে। এই অর্থে সেই এতগুলো নিরাপরাধ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। সত্যি সত্যি এতগুলো মানুষকে মেরে ফেললে যে ধরণের পরিতাপ হতে পারে, তার মনের অবস্থা তেমনটিই হয়ে গেল। তবে ডেলুশন অব সিন বা ডেলুশন অব

গিল্ট সিজোফ্রেনিয়ায় কম থাকে। থাকলেও তা বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকতে পারে। এগুলো থাকলে রোগীর সিজোফ্রেনিয়ার পাশাপাশি বিষন্নতা থাকতে পারে।

রোগী বিশ্বাস করে যে তার বিশেষ ধরণের ক্ষমতা আছে বা সে একজন বড় মাপের মানুষ। সে বিশ্বাস করে যে সে এমন একটি বিশেষ আবিষ্কার করছে যার ফলে সারা দুনিয়ার মানুষের জীবন বদলে যাবে। কেউ এবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে আর রক্ষে নেই। রোগী রেগে -মেগে একদম ফায়ার হয়ে যেত। একজন নিজেকে বড় কবি ভাবতো। একজন নিজেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে দাবী করতো ও তার বিশেষ বিশেষ কবিতা (আসলে রবি ঠাকুরের কবিতা) সবাইকে শোনাতো। একজন নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলে দাবী করলো। একজন নিজেকে বাংলাদেশের মালিক মনে করতো। একজন বিশ্বাস করতো যে, সে যদি উপবাস রেখে দোয়া করে তবে বিধাতা বৃষ্টি দেবেন বা খড়ার দোয়া করলে খড়া দিবেন। সে তার এই দক্ষতা দেশের কৃষিখাতের সেচপ্রকল্পে কাজে লাগাতে আগ্রহী ছিল। এধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে বলে **'গ্র্যান্ডিওস ডেলুশন'**। তবে সিজোফ্রেনিয়ার মধ্যে এধরণের ডেলুশন কম থাকে। এগুলো থাকলে রোগীর বাইপোলার মুড ডিজঅরডার আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগী ধর্ম সম্পর্কিত কোন ভ্রান্ত ধারণা পোষন করতে পারে। অনেক সময় প্রচলিত ধর্ম মতে আছে এমন বিষয়ে রোগী ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। যেমন, পুনরুত্থান বিষয়ক ধারণা, জন্মান্তরবাদ বিষয়ক ধারণা, শয়তান বা জ্বীন ভর করা বিষয়ক ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে রোগী ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে পারে। আবার অনেকে এধর্ম থেকে একটু, ও ধর্ম থেকে একটু, নিজের মনগড়া একটু, এভাবে নিয়ে নতুন ধর্মমত তৈরী করে এবিষয়ে ভ্রান্তধারণা পোষণ করে। এধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে **'রিলিজিয়াস ডেলুশন'** বলে। রোগী যদি নিজেকে একজন বড় ধর্ম প্রচারক মনে করে তবে এই ধরণের রিলিজিয়াস ডেলিউশন একই সাথে গ্রান্ডিওস ডেলুশনও হবে। যেমন, অনেকেই নিজেকে যীশু খ্রীষ্ট মনে করে মানুষকে ধর্মের পথে শেষবারের মতো আহ্বান জানাতে শুরু করে। রিলিজিয়াস ডেলিউশনের বশবর্তী হয়ে রোগী অনেক সময় এমন সব কথা বলে যাতে অনেক ধর্মমতের মানুষদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে। রোগীর জন্য এর ফল মাঝে মাঝে ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। অনেক সময় রিলিজিয়াস ডেলুশনের সাথে অন্যান্য আরো কিছু ডেলুশন যেমন, পাপবোদেও ডেলুশন, নিয়ন্ত্রিত হবার ডেলুশন ইত্যাদিও থাকতে পারে। কোন ভ্রান্তধারণা রিলিজিয়াস ডেলুশন কিনা তা রোগীর আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে নির্ধারণ করতে হবে।

রোগী বিশ্বাস করে যে তার দেহ কোন না কোনভাবে রোগগ্রস্থ হয়ে গেছে, অস্বাভাবিক হয়ে গেছে বা বদলে গেছে। সে হয়তো বিশ্বাস করলো যে তার পাকস্থলি বা মস্তিষ্ক পঁচে গেছে। একজন মনে করতো তার মস্তিষ্ক শুকিয়ে গেছে। কেউ হয়তো বিশ্বাস করলো যে তার হাত বা গোপন অঙ্গ টেনে বড় করে ফেলা হয়েছে, বা কেউ বিশ্বাস করলো যে তার চেহাড়ার বৈশিষ্ট্য অস্বাভাবিক। এধরণের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে **'সোমাটিক ডেলুশন'** বলা হয়। কোন

কোন সময়ে সোমাটিক ডেলিউশনের সাথে ট্যাকটাইল হেলিউসিনেশন বা অন্যান্য ধরণের হেলিউসিনেশন থাকতে পারে। যেমন, রোগী বিশ্বাস করে যে তার মস্তিষ্কের মধ্যে বল বিয়ারিং আছে। এগুলো একজন ডেন্টিষ্ট দাঁত ফিলিং করার সময় ওখানে রেখে দিয়েছে। এগুলো এদিক ওদিক গড়িয়ে যাচ্ছে। রোগী এমনকি এই গড়ানোর ও একটির সাথে অন্যটির বাড়ি খাবার শব্দ শুনতেও পায়।

রোগী বিশ্বাস করে যে আপাতঃদৃষ্টিতে তাৎপর্যহীণ সাধারণ ঘটনার সাথে তার বিশেষ ধরণের সম্পর্ক আছে। কেউ হয়তো সাধারণ কোন মন্তব্য করলো, কিছু একটা ঘটলো, কেউ কিছু বললো, রাস্তায় কেউ হাসলো- এগুলো সবই তাকে কেন্দ্র করে ঘটছে। রোগী কোন রুমে ঢুকলো, দেখলো মানুষ হাসাহাসি করছে বা হঠাৎ সবাই নীরব হয়ে গেল। রেডিও তে বা টিভিতে কোন অনুষ্ঠান বা কোন নাটক হচ্ছে, এর মানে এগুলো তার বিষয়ে কিছু একটা বলছে। পত্রিকায় একটা খবর বের হলো, একটা সম্পাদকীয় লেখা হলো। নির্ঘাত এটি তাকে নিয়েই লিখেছে। অথবা এর মাধ্যমে তাকে কোন বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে বলে সে বিশ্বাস করলো। রোগী কিছু অদ্ভূত যুক্তিও হাজির করলে এটি প্রমাণ করার জন্য। এই ধরণের ভ্রান্তধারণা যখন যথেষ্ঠ দৃঢ় হয় তখন তাকে বলে **‘ডেলুশন অব রেফারেন্স’**।

রোগী মনে করে যে তার চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণ অন্য কোন বাহ্যিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে। সে ভিতরে ভিতরে অনুভব করে যে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে বলে **‘ডেলুশন অব কন্ট্রোল’**। তবে মনে রাখতে হবে সাধারণ নিয়ন্ত্রণ এটি নয়। যেমন, মানুষ বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তা আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। বস্তুতঃ তিনি সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এটি ভ্রান্তধারণা নয়। পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আমি কি করবো আর কি না করবো সে বিষয়ে আমাকে প্রভাবিত করতে চাইতেই পারেন। এগুলো ডেলুশন অব কন্ট্রোল নয়। বরং রোগী বলবে যে কোন একটি ভীনগ্রহের শক্তি তার দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে একটি অদ্ভূতভাবে হাত নাড়তে ও দেহ নাড়তে তাকে বাধ্য করছে। সে যেন একটি বায়োলজিক্যাল রবোট হয়ে গেছে। তার ইচ্ছাশক্তি তার দেহকে চালিত করতে পারছেনা। বরং সেই বহিঃশক্তির আদেশ অনুযায়ী তাকে পরিচালিত হতে হচ্ছে। শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে তার মস্তিষ্কে আদেশ পাঠিয়ে তার মধ্যে নানা ধরণের অনুভূতি তৈরী করা হচ্ছে। রোগী পরিষ্কার বুঝতে পারে যে এই অনুভূতি গুলো আরোপিত। তার নিজস্ব নয়। এগুলো হলো ডেলুশন অব কন্ট্রোল।

রোগী বিশ্বাস করে যে তার চিন্তাগুলো মানুষ পড়তে পারে। তারা তার মনে কি চলছে তা পরিষ্কার করেই পড়তে পারে। এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে বলে **‘ডেলুশন অব মাইন্ড রিডিং’**।

রোগী বিশ্বাস করে যে তার চিন্তাগুলো রেডিওতে যেভাবে অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় সেভাবে সম্প্রচারিত হয়। ফলে রোগী নিজে বা অন্যরা এটি শুনতে পারে। এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে বলে **'থট ব্রডকাস্টিং'**। অনেক সময় রোগী বলে যে, চিন্তাগুলো যেন তার মাথার বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে। এটিকে অডিটরি হেলুসিনেশন ও ডেলুশন দুটোই বলা হয়। অনেক সময় রোগী বলে যে সে নিজে শুনতে না পেলেও তার চিন্তাগুলো সম্প্রচারিত হচ্ছে। অনেকসময় রোগী বিশ্বাস করে যে তার চিন্তগুলো একটি মাইক্রোফোনের সাহায্যে রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচার করা হচ্ছে।

রোগী বিশ্বাস করে যে তার নয় এমন চিন্তা তার মনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন, রোগী বিশ্বাস করলো যে একজন প্রতিবেশী কোন একটি গোপন যাদুবিদ্যার সাহায্যে তার মাথায় তার নয় এমন যৌন চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে বলে **'থট ইনসারশন'**।

রোগী মনে করে যে তার চিন্তাগুলো তার মন থেকে সড়িয়ে নেয়া হয়েছে। রোগী বলে যে সে একটি চিন্তা শুরু করেছিল ঠিকই, কিন্ত ঐ মুহুর্তে কোন একটি বহিঃশক্তি তার চিন্তা সড়িয়ে নেয়ায় তার আর চিন্তা শেষ করা সম্ভব হয়নি। এধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে বলে **'থট উইথড্রয়াল'**।

রোগীর আচার-আচরণ অস্বাভাবিক ও অদ্ভূত হয়। যেমন সে একটি বোতলে প্রস্রাব করে, দেহের দুই অংশ দুই রঙ করে রাখে, ছোট প্রাণী, যেমন, মুরগীকে আছড়ে মারে ইত্যাদি। অনেক সময় রোগী নিজেই তার এই ধরণের আচরণের কথা বলে। আবার অনেক সময় তার পরিবারের সদস্যরা এবিষয়ে বলে। অনেক সময় তার আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করেও তার অদ্ভূত আচরণের বিষয়ে জানা যায়। যদি অ্যালকোহল বা কোন নেশাদ্রব্যের প্রভাবে কেউ অদ্ভূত আচরণ করে তবে সেগুলো এখানে বিবেচনায় আসবেনা। আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিচার করে তবেই কোন আচরণ অদ্ভূত আর কোনটি স্বাভাবিক তা নির্ণয় করতে হবে।

রোগী অস্বাভাবিকভাবে পোষাক পরিচ্ছদ পড়ে। এছাড়াও আরো অনেক অদ্ভূত ভাবে নিজেকে সাজায় যাতে তাকে অন্যরকম লাগে। যেমন, একটি মেয়ে তার সব চুল কামিয়ে ফেললো। কেউ তার শরীরের একেক অংশ একেক রঙে রাঙিয়ে ফেললো। সে এমন ধরণের কাপড় পড়বে যা ঐ সমাজে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। সে হয়তো রাজা-বাদশাহ্ সেজে কোমড়ে নকল তলোয়াড় ঝুলিয়ে বিবাহের দাওয়াত খেতে বা অফিসে গেল। রোগী হয়তো প্যান্টের উপর একটি আন্ডারওয়্যার পড়ে কোথাও গেল। তীব্র গরমের মধ্যে সে মোটা স্যুয়েটার পড়লো। বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়াদি লিখে মাথায় ব্যান্ড পড়লো। হাতে লাঠি নিয়ে ধর্ম প্রচারকের মতো পোষাক পড়ে ধর্মীয় উপদেশ দিতে শুরু করলো।

স্বাভাবিক সামাজিক রীতিনীতির বাইরে যায় এমন সব কাজ রোগী করতে শুরু করলো। সে পরিবারের সদস্যদের সামনেই হস্তমৈথুন করতে শুরু করলো। সে নিজের গোপন অঙ্গ অন্যদের দেখাতে শুরু করলো। প্রচুর লোক থাকা সত্বেও সে মল-মূত্র ত্যাগ করতে শুরু করলো ও আশে-পাশের মানুষের বিষয়ে তার যেন কোন চেতনাই নেই। সে একা একা বিড় বিড় করে নিজের সাথেই কথা বলতে শুরু করলো। কখনো দেখেনি এমন মানুষদের সাথে অতি আন্তরিকতা নিয়ে কথা বলতে শুরু করলো। ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ সে বসে পড়ে প্রার্থণা শুরু করলো। বা হঠাৎ রাস্তার ভীড়ের মধ্যে যোগাসনে বসে যোগ ব্যায়াম করতে শুরু করলো। সে মানুষদেরকে অনাকাঙ্খিত যৌন ইঙ্গিত দিতে শুরু করলো।

রোগী প্রায়শঃই অত্যন্ত উত্তেজিত থাকতে পারে। প্রায়ই কোন কারণ ছাড়াই, কোন পূর্ব সঙ্কেত ছাড়াই সে হঠাৎ উত্তেজিত ও আগ্রাসী হয়ে উঠতে শুরু করতে পারে। সে তার পরিবারের সদস্যদের ও বন্ধুদের সাথে প্রায়ই তর্কাতর্কি শুরু করতে পারে। রাস্তায় পথচারীদের কোন কারণ ছাড়াই অভিযুক্ত করে তাদের সাথে ঝামেলা শুরু করলো। যাদের সাথে তার কিছুটা ঝগড়া আছে তাদেরকে বা সরকারের কাছে বিদ্বেষমূলক ও হুমকিপূর্ণ চিঠি, ই-মেইল বা টেক্সট পাঠাতে শুরু করলো। কোন কোন রোগী কচিৎ প্রাণী হত্যা করতে পারে বা মানুষ নির্যাতনের, আহত করার বা হত্যার চেষ্টা করতে পারে।

রোগী বারংবার একই আচরণ করার অভ্যাস করতে পারে। এটি সে করতে একদম বাধ্য থাকে। এর নানা ধরণের অদ্ভূত ব্যাখ্যা সে দাঁড় করায়। যেমন, এই অদ্ভূত আচরণগুলো করার মাধ্যমে সে অন্যদের প্রভাবিত করছে বা অন্যদের প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচাচ্ছে। একজন রোগী ছিল সে অদ্ভূত ভাবে নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করে মানুষের সাথে হ্যান্ডশেক করতো। একাজ করতে সে বাধ্য ছিল। কেউ নিয়ম অনুসরণ করে হ্যন্ডশেক না করে চলে যেতে নিলে সে পিছন পিছন গিয়ে ক্রমাগত অনুরোধ করে হ্যান্ডশেকের নিয়ম শেষ করতো। রোগী খাবার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও ধারাবাহিক অনুযায়ী খেতে পারে, একটা নির্দিষ্ট ধরণের পোষাক পড়তে পারে, পড়ার সময়ে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে পড়তে পারে। সে একই মেসেজ বারংবার মানুষকে পাঠাতে পারে, কখনো কখনো এই মেসেজগুলো অদ্ভূত ভাষায়ও লিখতে পারে। এক রোগী খুব খারাপ ভাষায় অশ্লীল ধরণের মেসেজ লিখে পরিচিত মানুষদেরকে পাঠাতো। এজন্য কেউ তাকে ধরলে সে অস্বীকার করতো। এভাবে বার বার সে পাঠাতে থাকতো।

ভাষার স্বচ্ছতা থাকা সত্বেও, ভাষার প্রাচুর্যতা থাকা সত্বেও কোন কারণে যদি ঠিকমতো ভাব বিনিময় বা কমিউনিকেশন করা না যায় তবে তা **‘পজিটিভ ফরমাল থট ডিজঅরডারের’** কারণে হতে পারে। এক্ষেত্রে কোন রকম পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই রোগী একটি বিষয়বস্তু থেকে অন্য বিষয়বস্তুতে সরে যেতে থাকে। আশে-পাশের পরিবেশ দিয়ে সে সহজেই প্রভাবিত হয়। তার মনোযোগ সড়ে যায়। এমন কিছু শব্দ একসাথে জুড়ে কথা বলে যেগুলোর উচ্চারণের মধ্যে বা অর্থগতভাবে মিল আছে। এটি করতে গিয়ে অনেক সময়েই তাদের কথাটির বা

লাইনটির কোন অর্থই থাকেনা। তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তার উত্তর না দিয়ে অন্য একটি বিষয়ে সে প্রশ্ন করে। তাদের কথাগুলো অনেক সময় বেশ দ্রুতলয়ের হয় এবং এগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব থাকে। এই কথাগুলো অসঙ্গতিপূর্ণ হয়। রোগী যথেষ্ঠ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ কথা বলে। রোগীর কথা মনোযোগ দিয়ে মিনিট দশেক শুনলেই তার পজিটিভ ফরমাল থট ডিজঅরডার আছে কিনা তা বোঝা যায়। রোগীর কথাগুলো ধারাবহিকতা অনুসরণ করে বলছে কিনা তা লক্ষ্য করতে হবে। তার কথায় অস্পষ্টতা থাকলে তাকে বিভিন্ন বিষয়ে পরিষ্কার করে বলতে অনুরোধ করতে হবে। তাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতে হবে ও সে কতটা স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে এবিষয়গুলোর উত্তর দেয় তা খেয়াল করতে হবে।

কথা বলার সময় রোগী একটি বিষয়বস্তু থেকে সামান্য একটু মিল আছে এমন বিষয়বস্তুতে সড়ে সড়ে যায়। এমনকি অনেক সময় এক বিষয় হতে একদম সম্পর্ক নেই এমন বিষয়বস্তুতে কথা বলতে শুরু করে। আলোচনার মধ্যে কেমন একটা খাপছাড়া ভাব থাকে। একে বলে **'ডিরেইলমেন্ট বা লুজেনিং অব অ্যাসোসিয়েশন'**।

রোগীকে একটি প্রশ্ন করলে তার উত্তরে সে এমন সব কথা বলতে পারে যার সাথে প্রশ্নের যথার্থ উত্তরের সাথে খুব সামান্য সম্পর্কই আছে। আবার অনেক সময় রোগী একদম সম্পর্কহীন উত্তর দিয়ে দেয়। একে বলে 'ট্রানজ্যানশিয়ালিটি'।

রোগী এমনভাবে কথা বলে যার কোন মানে হয়না। যেভাবে বাক্যগুলো বিন্যস্ত হবার কথা তা তেমনভাবে থাকেনা। শব্দগুলো এলোমেলোভাবে যুক্ত হয়। একে বলে **'ইনকোহেরেন্স বা ওয়ার্ড সালাদ বা স্কিজোফ্যাসিয়া'**।

আলোচনার সময় রোগী হঠাৎ এমন ধরণের সিদ্ধান্তে পৌছে যায় যা ঐ আলোচনার যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত হতে পারেনা। ঘটনা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌছাবার যুক্তিসঙ্গত ধারাগুলো রোগী অনুসরণ করতে পারেনা। একে বলে **'ইল্লজিক্যালিটি'**।

আলোচনার সময় কোন প্রশ্নের উত্তরে বা প্রসঙ্গক্রমে রোগী প্রচুর অপ্রসঙ্গিক কথা বলে, খামোখা মন্তব্য করে, অনেক সময় নষ্ট করে শেষ পর্যন্ত তার আলোচনার বিষয়বস্তুতে ফিরে। স্বাক্ষাতকারগ্রহণকারীকে সময়মতো স্বাক্ষাতকারের কাজ শেষ করার জন্য রোগীকে বার বার মূল বিষয়ে কথা বলার জন্য বলতে হয়। একে বলে **'সারকাম্‌স্ট্যনশিয়ালিটি'**। বাধা না দিলে রোগী বহুক্ষণ ধরে এমন ধরণের অযৌক্তিক দীর্ঘসূত্রী আলোচনা চালিয়ে নিতে পারে।

সাধারণ মানুষ যে পরিমাণ কথা বলে রোগী তার থেকে অনেক দ্রুত ও অনেক বেশী কথা বলতে থাকে। মনে হয় যেন, সে থামতেই পারেনা। ভিতর থেকে ক্রমাগত যেন কথাগুলো বেরিয়ে আসছে। তাকে থামানো দুরূহ হয়ে যায়। দ্রুত নতুন একটি ধারণার কথা বলার উৎসাহের কারণে রোগী অনেক সময় বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে পরের লাইনে চলে যেতে পারে। সাধারণ প্রশ্নের উত্তর যা এক দুই শব্দে বা সর্বোচ্চ এক বাক্যে দেয়া যায় তার উত্তরে রোগী মিনিটের পর মিনিট কথা বলতেই থাকে। বাধা না দিলে থামেনা। প্রায়ই বাধা দিলেও কথা চালিয়ে যায়। যার কথা বলার তীব্র আকাঙ্খা তৈরী হয়েছে এমন রোগীরা আশে পাশে কেউ না থাকলেও বা কেউ শুননতে না চাইলেও কথা বলতেই থাকে। এমনকি যখন আশে-পাশে যখন কেউ থাকেনা তখনো কথা চালিয়ে যায়। একে বলে **'প্রেসার অব স্পিচ'**। মিনিটে যদি কেউ ১৫০ বা তার বেশী শব্দ বলে তবে তার 'প্রেসার অব স্পিচ' আছে। প্রেসার অব স্পিচের সাথে প্রায়ই ডিরেইলমেন্ট, ট্যানজেনশিয়ালিটি অথবা ইনকোহেরেন্স একসাথে দেখা যায়। তবে সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের মধ্যে প্রেসার অব স্পিচ কম থাকে। এমনটা হলে মুড ডিজঅরডার আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে।

কথা বলার সময় কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে রোগী থেমে যায়। যে বিষয়ে বলছিল বা যে বাক্যটি বলছিল তা শেষ না করে পরিবেশের কোন একটি বিষয়ে কথা বলতে শুরু করে। যেমন, টেবিলে রাখা কোন কিছুর বিষয়ে বা স্বাক্ষাতকারগ্রহণকারীর পোষাক নিয়ে আলোচনা শুরু করলো। এবিষয়টিকে বলে **'ডিষ্ট্র্যাক্টিবল স্পিচ'**।

রোগী কথার বলার সময় বা বাক্য বলার সময়, শব্দমালা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুনতে মিল আছে সে সব শব্দ সেগুলো একসাথে বলে। তাতে কথার মানে না হলেও অসুবিধা নেই। আবার কোন কোন রোগী কথা বলার সময় উচ্চারণে কিছুটা মিল আছে এমন শব্দ ব্যবহার করে। এরপর ঐ শব্দের সাথে কিছুটা মিল আছে এমন শব্দ ব্যবহার করলো। তারপর তার সাথে কিছুটা মিল আছে এমন শব্দ ব্যবহার করলো। প্রতিটি বাক্যের একটি মানে দাঁড়ালেও বিষয়বস্তু অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে বদলে যেতে থাকায় পুরো প্যারার আর কোন সামগ্রিক অর্থ দাঁড়ায়না। রোগী অনেক কথাই বললো, কিন্তু বোঝা গেলনা কিছু। এবিষয়টিকে বলে **'ক্ল্যনজিং'**। যেমন,' নদীর কুল, কুল গাছ, গাছ পালা.. ..' এভাবে রোগী কথা চালিয়ে যেতে পারে।

রোগীর আবেগের প্রকাশটি হয় অসঙ্গতিপূর্ণ। অর্থাৎ পরিস্থিতি অনুযায়ী হয়তো তার দুঃখিত হওয়ার কথা। কিন্তু খুবই হাসি-খুশি ও আনন্দিত হলো। যেমন, একজন মহিলা রোগী হেসে একদম কুটিপাটি হয়ে বললো তার ভাল একটা ঘটনা ঘটেছে। তার মা গত বুধবার দিন মারা গেছে। এগুলো ইনকনগ্রুয়েন্ট মুডের বহিঃপ্রকাশ।

সিজোফ্রেনিয়া রোগ নির্ণয় করা অতি দুরূহ কাজ। এজন্য এখানে আলোচিত কিছু লক্ষণ দেখেই আমরা কারো সিজোফ্রেনিয়া আছে কিনা সনাক্ত করে ফেলবো এমনটা আশা করা যায়না। তবে এই লক্ষণগুলো বা এর মধ্যে কিছু লক্ষণ কারো মধ্যে যদি থাকে তবে আমরা রোগীকে একজন মানসিক রোগের ডাক্তার বা সাইকিয়াট্রিষ্টকে দেখাতে পারি। তিনি রোগ নির্ণয় করে দেবেন। এই রোগ দ্রুত সনাক্ত করা গেলে চিকিৎসায় ভাল ফল আশা করা যায়। এছাড়া দ্রুত চিকিৎসা করা গেলে রোগের ফলে রোগীর শিক্ষাগত, পেশাগত, সামাজিক, আন্তঃর্ব্যক্তিক ও পারিবরিক জীবনে যে ক্ষতি হয় তা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। এই রোগী হয়তো আপনার আশে-পাশেই আছে। হয়তো আপনার ঘনিষ্ঠ জন, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, সমাজের কারো এই রোগ আছে। আসুন সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের দ্রুত সনাক্ত করি ও চিকিৎসা নিশ্চিত করি।

এবার আমরা সিজোফ্রেনিয়ার নেগেটিভ লক্ষণগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। রোগীর চেহাড়ায় আবেগ প্রকাশের ঘাটতি দেখা যায়। অনেক সময় আবেগের কোন প্রকাশই থাকেনা। রোগীর চেহাড়া একদম কাঠের পুতুলের মতো লাগে। চেহাড়া কোনই পরিবর্তন হয়না, হলেও খুব সামান্য পরিবর্তন হয়। রোগী চুপ করে একভাবে বসে থাকে, স্বতঃস্ফূর্ত কোন নড়াচড়া তার থাকেনা। সে তার দেহ নাড়াচাড়া করেনা, পা বা হাতও নাড়ায়না। যদি কারো সামান্য হাত-পা নড়েও, তা স্বাভাবিক মানুষদের তুলনায় অনেক কম নড়ে। সাধরণতঃ আমরা কথা বার্তা বলার সময় আমাদের হাত-পা নড়াচড়া করি। কিন্তু এই রোগীরা তাদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য হাতের নড়াচড়া, সামনের দিকে বা পিছের দিকে ঝুঁকে বসা ইত্যাদি করেনা বা করলেও তা সাধারণ মানুষ থেকে অনেক কম করে। রোগীর দিকে তাকিয়ে বন্ধুসুলভ হাসি দিলে সে তার উত্তরে হাসেনা। রোগী কথা বলার সময়ও মানুষের চোখের দিকে না তাকিয়ে শূন্যে তাকিয়ে কথা বলে। সে তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য চোখের ব্যবহার করতে পারেনা। কথা বলার সময় রোগীর স্বরের স্বাভাবিক উঠানামা থাকেনা। বরং সে একঘেয়ে সুরে কথা বলতেই থাকে। গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোতে সে স্বরের উঠানামা করিয়ে জোড় দিতে পারেনা। সাধারণ মানুষ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী স্বরের উঠানামা করায়। কিন্তু রোগী তার ব্যক্তিগত গোপন কথা বলার সময়ও স্বর নামাতে পারেনা আবার যখন জোড়ে কথা বললে গুরুত্ব বাড়বে এমন পরিস্থিতিতেও স্বর উচ্চে উঠাতে পারেনা। এমনকি উত্তেজনাপূর্ণ কোন ঘটনার বিবরণ দেবার সময়ও সে একঘেয়ে সুরে কথা বলতে থাকে।

সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে, তাদের মনোজগতের প্রক্রিয়ার মধ্যে একধরণের ঘাটতি দেখা যায়। তাদের চিন্তার মধ্যে একধরণের ফাঁকা ভাব আছে, তারা চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক ধীরগতির। যেহেতু চিন্তাকে সরাসরি দেখা যায়না, তাই রোগীর কথা থেকে চিন্তার বিষয়ে অনুমান করতে হয়। রোগী খুব কম কথা বলে। একে **পভার্টি অব স্পিচ** বা চিন্তার শূণ্যতা বলে। এই রোগীদের প্রশ্ন করলে স্বতস্ফূর্ত উত্তর দেয়না। উত্তরগুলো হয় সংক্ষিপ্ত, মূর্ত ও ব্যাখ্যা ছাড়া। জিজ্ঞাসা না করলে রোগী অতিরিক্ত কোন তথ্যই দিতে চায়না। এক-দুই শব্দে প্রশ্নের উত্তর দেয়। কোন কোন প্রশ্নের একদম কোন উত্তরই দেয়না। তার সাথে যিনি কথা বলেন তাকে ক্রমাগত আরো তথ্যের জন্য

জিজ্ঞাসা করতে হয়। রীতিমত উৎসাহিত করতে হয়। রোগীর সাথে কথা বলার সময় তার কথা লক্ষ্য করলে বিষয়টি বুঝতে পারা যায়।

আবার কোন কোন রোগী অনেক কথা বললেও তার মধ্যে বক্তব্য খুব একটা থাকেনা। ভাষা অস্পষ্ট হয়, অতিরিক্ত মূর্ত বা অতিরিক্ত বিমূর্ত হয়, পুনরাবৃত্তিমূলক ও একটি নির্দিষ্ট ধরণ অনুসরণ করে সে কথা বলে। স্বাক্ষাতকারগ্রহণকারী লক্ষ্য করলে দেখেন যে, রোগী অনেক্ষণ ধরে অনেক কথা বলেছে কিন্তু বক্তব্যের মধ্যে তেমন তথ্য নেই। অনেক ক্ষেত্রে তার কথায় তথ্য থাকে ঠিকই, কিন্তু অনেক গুলো কথার মধ্যে এক - দুই লাইনে বলা যায় এমন সংক্ষিপ্ত পরিমাণ তথ্য থাকে। এই ধরণের কথাকে ফাঁকা দর্শন কপচানোও বলা যেতে পারে।

কোন কোন রোগী কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়। একে বলে **ব্লকিং**। ব্লকিং-এ চিন্তাটি শেষ হবার আগেই হঠাৎ বিঘ্নিত হয়ে যায়। কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট পর রোগী কি বলতে যাচ্ছিল বা বলছিল তা ভুলে যায় ও আর কথাটি শেষ করতে বা চালাতে পারেনা। হঠাৎ থামার কারণ জিজ্ঞাসা করলে যদি সে কি বলছিল তা হারিয়ে গেছে বা ভুলে গেছে বলে উল্লেখ করে তবে ব্লকিং এর ব্যাপারটি আমরা বুঝতে পারি।

আবার কাউকে প্রশ্ন করার অনেকক্ষণ পর সে উত্তর দেয়। সে কেমন যেন আনমনা থাকে। অনেক সময় প্রশ্নকর্তার মনে সন্দেহ হয় যে, রোগী আদতেও প্রশ্নটি শুনেছে কিনা। জিজ্ঞাসা করলে রোগী বলে যে, সে প্রশ্নটি শুনেছে কিন্তু চিন্তাগুলো গুছিয়ে একটা উপযুক্ত উত্তর দিতে তার সমস্যা হচ্ছে, সময় লাগছে।

সিজোফ্রেনিয়া রোগীর কোন কাজ করার মতো স্পৃহা, শক্তি বা আগ্রহ থাকেনা। অনেক ধরণের কাজ তারা শুরু বা শেষ করতে পারেনা। এই ব্যর্থতার ফলে রোগীদের সামাজিক ও আর্থিক জীবনে গুরুতর ক্ষতির সৃষ্টি হয়। পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রতি রোগীর মনোযোগ কমে যায়। সে এক কাপড় বহুদিন ধরে পড়ে থাকে। একদম জীর্ণশীর্ণ কাপড়। কাপড় পরিচ্ছন্ন থাকেনা, গন্ধ হয়ে যায়। গোসল কম করে, চুল আঁচড়ায়না, নখ কাটেনা, দাঁত মাজেনা। ফলে চুল আগোছালো থাকে, চুলে জটা ধরে যেতে পারে। তাদের হাত নোংরা থাকে, শরীরে দূর্গন্ধ হয়, দাঁত ময়লা থাকে, শ্বাসে গন্ধ হয়। সার্বিকভাবে তাদের দেখতে মোটেই সুবিধার লাগেনা। কারো কারো পায়খানা-প্রস্রাবের অভ্যাসের মধ্যেও গোলমাল লেগে যায়। ঘর ও কাপড়-চোপড় নোংড়া করে ফেলে।

সিজোফ্রেনিক রোগী শিক্ষাজীবন বা কর্মজীবন টিকিয়ে রাখতে পারেনা। রোগী যদি ছাত্র হয় তবে সে বাড়ির কাজ করেনা এমনকি ক্লাশেও অনুপস্থিত থাকে। তার পরীক্ষার ফলও খারাপ হয়। সে প্রায়ই কলেজে অনেক গুলো

কোর্স নিয়ে পড়া শুরু করে, কিন্তু শিক্ষা বর্ষ শেষ হবার পূর্বেই পড়া ছেড়ে দেয়। রোগী কোন কাজে টিকে থাকতে পারেনা। তাদের কোন কাজে লেগে থাকা বা কাজটি শেষ করার ধৈর্য্যের অভাব আছে। এছাড়া সে দায়ীত্বশীল আচরণ করতেও ব্যর্থ হয়। সে কাজে প্রতিদিন যেতে পারেনা, দেরিতে কর্মস্থলে পৌঁছে, কাজের সময়ে এলোমেলো ঘোরাফেরা করে, কর্মস্থল দ্রুত ত্যাগ করে, কাজগুলো আগোছালো ভাবে সম্পন্ন করে। সে হয়তো বাড়িতে বসে থাকলো। শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন হয়েও কাজ খোঁজার কোন চেষ্টাই করলোনা। যদি চাকুরী খুঁজেও তা করে অনিয়মিত ও এলোমেলো ভাবে। গৃহবধূ বা অবসরপ্রাপ্ত মানুষগুলো ঘরের কাজ ঠিকমতো করতে পারেনা, তারা ঘর পরিচ্ছন্ন করা, ময়লা ফেলা, বাসন-কোসন ধোয়া ইত্যাদি করতে পারেনা। কেউ কেউ করলেও করে যেনতেন ও অনিচ্ছুক ভাবে। শারীরিক ভাবে রোগীরা একদম গুটিয়ে যায়। একটা চেয়ারে একটুও নড়া-চড়া না করে সে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে পারে। তাকে কিছু করতে বললে অল্প সময়ের জন্য কোন একটা কাজে অংশ নিয়ে সরে পড়ে ও একা আবার বসে থাকে। যেসব কাজে তেমন কোন অংশগ্রহণ প্রয়োজন হয়না তেমন কাজে রোগী অনেক সময় ব্যয় করে। যেমন, বসে বসে টিভি দেখে। রোগীর আত্মীয়রা বলে যে রোগী দিনের বেশীর ভাগ সময় কিছুই না করে চুপ করে বসে বা শুয়ে কাটিয়ে দেয়। তার নিজের রুমেই তার সময় কেটে যায়।

সিজোফ্রেনিযার রোগীর আগ্রহ ও আনন্দ নেবার প্রবণতা কমে যায়। আগে যেসব কাজে আগ্রহ পেত এখন আর পায়না, যেসব কাজে অন্যরা আনন্দ পায় রোগী তাতেও আনন্দ পায়না। রোগীর আগ্রহের বা সখের কিছু থাকেনা। থাকলেও তা খুব কমে যায়। লক্ষণটি ধীরে ধীরে শুরু হয়। আগের অবস্থার তুলনায় রোগী অনেকটা বদলে যায়। যাদের এই লক্ষণ একটু কম তীব্র তারা এমন কিছু কাজকর্মে অংশ নেয় যেগুলোতে তাকে ততটা স্বক্রিয় থাকতে হবেনা। যেমন, টিভি দেখা বা কোন কাজে সাময়িক আগ্রহ দেখানো। গুরুতর লক্ষণ যুক্ত রোগীরা সব ধরণের কাজে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে ও বিশেষতঃ আনন্দের কিছুই করেনা। রোগী যৌন বিষয়ে ততটা আগ্রহী হয়না । দেখা যায় স্ত্রী বা স্বামীর অনুরোধেই কেবল রোগী যৌন ক্রিয়ায় অংশ নেয়, নিজের আগ্রহ থাকেনা। অনেক ক্ষেত্রে যৌন মিলন একদম বন্ধ করে দেয়। রোগীকে জিজ্ঞাসা করলে রোগী বলে যে তার যৌন বিষয়ে আগ্রহ একদম কমে গেছে বা যৌন কাজে সে আনন্দ পায়না বা খুব কম পায়। সিজোফ্রেনিক রোগীরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে বা অনুভব করতে পারেনা। তারা বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি, নিজের ভাই-বোনের প্রতি ও বাবা-মায়ের প্রতি ঘনিষ্ঠতা অনুভব করেনা। বিবাহিত রোগীরা তার স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি ও সন্তান-সন্ততির প্রতি ঘনিষ্ঠতা অনুভ করেনা। তাদের স্নেহ-মমতা কমে যায়। তারা একা থাকতে পছন্দ করে ও জীবন-সঙ্গী/ সঙ্গিনীর সাথে মেশার ইচ্ছা থাকেনা। নানা ধরণের সামাজিক কাজকর্মেও রোগী আগ্রহ হারায়। সম লিঙ্গের বা বিপরীত লিঙ্গের বন্ধু- বান্ধবীদের প্রতি সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে রোগীর আগ্রহ কমে যায়। একা থাকতেই পছন্দ করে।

সিজোফ্রেনিক রোগীদের মনোযোগ দেবার ক্ষমতা কমে যায়। তারা মনোযোগ দিতে সমস্যা বোধ করে বা সামীয়ক ভাবে মনোযোগ দিতে পারে, কিন্তু বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখতে পারেনা। তাদের সাথে কথা বলতে গেলে তারা হয়তো তা অগ্রাহ্য করে। স্বাক্ষাতকার নেবার সময় আনমনা থাকে বা উঠে অন্য কোন দিকে চলে যায়। তার এই

মনোযোগের সমস্যার বিষয়ে সে সচেতন বা অসচেতন দুইই থাকতে পারে। সামাজিক পরিবেশে রোগীকে অমনোযোগী বলে মনে হয়। আলোচনার সময় সে আরেক দিকে তাকিয়ে থাকে, আলোচনার পর্যায়ক্রমে সে কোন বিষয়বস্তু বেছে নিতে পারেনা, তাকে দেখে বোঝা যায় যে সে যেন এখানে নেই। যখন খেলাধুলা করে, টেলিভিশন দেখে বা পত্রিকা পড়ে তখনো রোগীর মনোযোগ কম থাকে। পর্যাপ্ত বুদ্ধি মত্তা ও শিক্ষাগত সাফল্য থাকা সত্বেও রোগী সাধারণ বুদ্ধি পরিমাপকারী অভীক্ষায়ও খারাপ করে। সাধারণ শব্দের উল্টো করে বানান করতে বললে, যেমন, 'পৃথিবী' শব্দটির উল্টো করে বানান করতে বললে রোগী তা পারেনা। রোগীকে ১০০ থেকে সাত করে বা তিন করে অন্ততঃ পাঁচ বার বিয়োগ করতে দিলে তা রোগী পারেনা। তবে এই ধরণের কাজ রোগীকে দিতে গেলে আগে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে রোগী শিক্ষিত হয়। অশিক্ষিত রোগী শিক্ষার অভাবের কারণেই এটা পারবেনা। অশিক্ষার কারণে না পারলে তা কিন্তু লক্ষণ হবেনা।

লেখকঃ মোঃ জহির উদ্দিন, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট, সহকারী অধ্যাপক, সাইকোথেরাপি বিভাগ, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা। ইমেইলঃ zahirm_bd@yahoo.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ ডা. ফারজানা রহমান, সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট।

নোটঃ বর্তমান লেখাটি বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪ উপলক্ষ্যে নভেম্বর ২০১৪-তে লেখা হয়।